ফেলুদা সমগ্র

লন্ডনে ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. টেলিভিশনটা কিনে............................ 2

২. চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মক্কেল............................ 8

৩. দিল্লির স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন............................ 15

৪. লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া............................ 20

৫. আমাদের হোটেলটা বেশ বড়............................ 25

৬. আকাশ মেঘলা............................ 30

৭. টিউবে করে এপিং............................ 35

৮. টাইমসে ফেলুদার বিজ্ঞাপন............................ 39

৯. হোটেলে আত্মহত্যা............................ 45

১. টেলিভিশনটা কিনে

টেলিভিশনটা কিনে কোনও লাভ হল না মশাই বললেন লালমোহনবাবু। দেখার মতো কিসু থাকে না। রামায়ণ মহাভারত দুটোই দেখতে চেষ্টা করেছি। পাঁচ মিনিটের বেশি স্ট্যান্ড করা যায় না।

আপনি যে খেলাধুলোয় ইন্টারেস্টেড নন, বলল ফেলুদা। তা হলে দেখতেন মাঝে মাঝে বেশ ভাল প্রোগ্রাম থাকে। টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল-কেনিওটাই বাদ নেই। যেমন দেশের খেলা, তেমনি বিদেশের খেলা।

তবে ওরা আমার একটা গল্প থেকে টি ভি সিরিয়াল করতে চাচ্ছে।

বাঃ এ তো ভাল খবর।

ভাল মানে? প্রখর রুদ্র করবে। এমন কোনও অ্যাকটর আছে বাংলাদেশে? অথচ ও দেশে দেখুন-সুপারম্যানের জন্য পর্যন্ত লোক পেয়ে গেল। মনে হয় একেবারে বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে?

আমাদের পাড়ায় কোনও বড় পুজো নেই। তবে একটু দূরেই আছে, সেখান থেকে মাঝে মাঝে লাউডস্পিকারে হিন্দি গান ভেসে আসছে! লালমোহনবাবু তার সঙ্গে গলা মেলাতে চেষ্টা করে পারছেন না। গানটা ভদ্রলোকের একেবারেই আসে না, যদিও বলেন ওঁর দাদামশাই নাকি খান ত্রিশোক ওস্তাদি গান রেকর্ড করেছিলেন।

চা এক প্রস্থ হয়ে গেছে, আরেকবার হবে কি না ভাবছি। এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম। আর তার পরেই ডোরবেল।

দরজা খুলে দেখি এক লম্বা চওড়া ধবধবে ফরাসী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

এটা কি প্রদোষ মিত্রের বাড়ি?

আজ্ঞে হ্যাঁ–আসুন ভিতরে! ফেলুদা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ধুতি, পাঞ্জাবি আর কাঁধে সাদা চাদর। পায়ে সাদা পাম্প শু। আভিজাত্য ফুটে বেরোচ্ছে সমস্ত শরীর থেকে।

বসুন, বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে লালমোহনবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন। ইনি আমার বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী, বলল ফেলুদা। লালমোহনবাবু একটা নমস্কার করলেন, কিন্তু ভদ্রলোক যেন সেটা দেখেও দেখলেন না। পায়ের উপর পা তুলে গিলে করা ধুতির কোঁচটাকে সযত্নে কোলের উপর রেখে বললেন, আপনার কথা আমায় বলে পাইকপাড়ার সাধন চক্রবর্তী।

ওঁর একটা তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম, বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক আপনার সুখ্যাতি করলেন, তবে ডিটেল কিছু দেননি। আপনি ক'দিন ধরে করছেন। এ কাজ?

বছর দশেক হল।

সিসটেমটা দিশি না বিলিতি?

যে কেসে যেমনটা দরকার হয়। আর কী।

আই সি...

আপনার সমস্যাটা কী সেটা যদি বলেন...

সেটাকে সমস্যা বলা চলে কি না জানি না। সেটা আপনিই বিচার করবেন।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। তারপর তার থেকে সযত্নে একটা ছবি বার করে ফেলুদাকে দিলেন। আমি ফেলুদার কাঁধের উপর দিয়ে দেখলাম ফিকে হয়ে যাওয়া পুরনো একটা ফোটোগ্রাফ, তাতে রয়েছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে দুজন প্যান্ট-শার্ট পরা ছেলে। তাদের বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি নয়।

এর মধ্যে কাউকে চিনছেন কি? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

বাঁ দিকের জন তো আপনি, বলল ফেলুদা।

হ্যাঁ, ওই একজনকেই আমিও চিনতে পারছি।

অন্যটি আপনার বন্ধু অবশ্যই।

দেখে তো তাই মনে হয়, তবে ওর পরিচয় ধরতে পারিনি। ছবিটা আমি সম্প্রতি পেয়েছি। একটা দেরাজের কাগজপত্রের তলায় ছিল। আপনাকে আমি একটিমাত্র কাজ দিতে এসেছি। ভূবে দেখুন। সেটা নেবেন কি না।

কী কাজ?

আমার সঙ্গে ওই ছেলেটি কে সেটা আমার জানা চাই। এর পরিচয় আপনাকে অনুসন্ধান করে উদঘাটন করতে হবে। ও কোথায় আছে কী করে, আমার সঙ্গে পরিচয় হল কবে, কী করে-সে সব আমার জানা চাই। সেটা করলেই আপনার কাজ শেষ! এর জন্য আপনার পুরো পারিশ্রমিক আমি দেব।

আমার আগে জানা দরকার আপনি নিজে কোনও খোঁজ করেছেন কি না।

ক্লাবে আমার স্কুল-কলেজের কয়েকজন সহপাঠী আছে, আমি তাদের দেখিয়েছি। তারা কেউ চিনতে পারেনি। আপনি লক্ষ করবেন। ছেলেটি বাঙালি কি না তাও বোঝা শক্ত।

চুলটা তো কালো, তবে চোখ দুটো যেন একটু কটা। আপনার সাহেব বন্ধু ছিল কখনও?

আমি ইংল্যান্ডে চার বছর স্কুলে আর এক বছর কলেজে পড়ি। বাবা ওখানে ডাক্তারি করতে গিয়েছিলেন। তারপর অবিশ্যি আমরা সবাই দেশে ফিরে আসি। ফিরে আসার আগে ইংল্যান্ডের কোনও কথা আমার মনে নেই, কারণ ওখানে থাকতে বাইসিকল থেকে পড়ে গিয়ে আমার স্কাল ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। তার ফলে পাঁচ-সাত বছরের স্মৃতি আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে।

কোন স্কুল আর কলেজে পড়েছিলেন সেটা মনে নেই?

বাবা বলেছিলেন। সে-ও অনেক বছর আগে। কলেজ বোধহয় কেমব্রিজ। স্কুলের নাম মনে নেই।

স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও ওষুধ-টষুধ খাচ্ছেন না?

অ্যালোপ্যাথিক খেয়েছি! তাতে কোনও কাজ হয়নি। এখন একটা কবিরাজি ওষুধ খাচ্ছি।

ইংল্যান্ড থেকে ফিরে কী হয়?

সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হই। বাবাই সব ব্যবস্থা করে দেন, কারণ তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি।

সেটা কোন বছর?

ফিফটি টু। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই।

হুঁ...।

ফেলুদা ছবিটা হাতে নিয়ে মিনিটখানেক ভাবল। তারপর প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয় এই ছেলের সঙ্গে কোনও একটা বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে?

সেরকম মনে হয়েছে। এক-এক সময় আবছা আবছা স্মৃতি ফিরে আসে, আর তখন যেন একে দেখতে পাই। কিন্তু এর পরিচয় অজানাই থেকে যায়। অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার। যার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব ছিল সে কে, সে এখন কোথায় আছে, কী করে, আমাকে মনে রেখেছে কি না, এ সব জানার জন্য প্রবল কৌতুহল হয়। কাজটা সহজ না বুঝতে পারছি, কিন্তু সেই কারণেই হয়তো আপনি ইন্টারেস্টেড হতে পারেন।

ঠিক আছে। কাজটা আমি নিচ্ছি। তবে এতে কত সময় লাগবে তা আমি বলতে পারছি না। আর ধরুন যদি বিলেত যেতে হয়?

তা হলে আপনার এবং আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টের প্লেন ভাড়া আমি দেব, ওখানে হোটেলে থাকার খরচ আমি দেব, যে পাঁচশো ডলার আপনাদের প্রাপ্য তার টাকাটা আমি দেব। বুঝতেই পারছেন আমি এর পরিচয় পাবার জন্য কতটা আগ্রহী।

আপনার বাবা কি-?

মারা গেছেন। বিলেত থেকে ফেরার পাঁচ বছরের মধ্যেই। মা-ও মারা গৈছেন। দশ বছর। হল। আমার স্ত্রী বর্তমান। একটিই সন্তান আছে-আমার মেয়ে। সে বিয়ে করে দিল্লিতে রয়েছে। স্বামী আই. এ. এস; এই হল আমার কার্ড। এতে আমার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সবই পাবেন।

কার্ডটা দেখলাম। নাম-রঞ্জিন কে. মজুমদার; ঠিকানা-১৩ রোল্যান্ড রোড, ফোন- sbr-68ൄ>]

ফেলুদা বলল, আমি আপনার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রাখব। কোনও প্রয়োজন হলে আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব?

ভদ্রলোক উঠে পড়ে বললেন, ছবিটা তা হলে আপনার কাছেই রইল।

হ্যাঁ। ওটার একটা কপি করে ওরিজিনালটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব। ভাল কথা– আপনি কী করেন সেটা তো জানা হল না।

সরি। আমারই বলা উচিত ছিল। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বি, কম পাশ করি সেন্ট জেভিয়ার্স থেকেই। লী অ্যান্ড ওয়াটকিনস হচ্ছে আমার আপিসের নাম।

থ্যাঙ্ক ইউ।

আসি তা হলে। গুড ডে।

অভিনব মামলা, ভদ্রলোকের গাড়ি চলে যাবার পর বললেন লালমোহনবাবু।

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, বলল ফেলুদা। এমন কেস আর পেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

একবার ছবিটা দেখতে পারি কি?

ফেলুদা ছবিটা জটায়ুকে দিল। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, সাহেব না। ইন্ডিয়ান তা বোঝার কোনও উপায় নেই। এ কেস আপনি কীভাবে কনডাক্ট করবেন তা আমার মাথায় আসছে না।

আপনার মাথার প্রয়োজন নেই। ফেলুমিত্তিরের মাথায় এলেই হল।

২. চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মক্কেল

ফেলুদার একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মক্কেল ছিল, নাম ধরণী মুখার্জি। ফেলুদা টেলিফোনে তার সঙ্গেই যোগাযোগ করল। ভদ্রলোক বললেন, রঞ্জন মজুমদারকে খুব ভাল করে চেনেন, কারণ দুজনেই স্যাটার্ডে ক্লাবের মেম্বার। রঞ্জনবাবু কীরকম লোক জিজ্ঞেস করাতে ধরণীবাবু বললেন যে, তিনি একটু চাপা ধরনের লোক, বিশেষ মিশুকে নন, বেশিরভাগ সময় ক্লাবে চুপচাপ একা বসে থাকেন। ড্রিংক করেন–তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়। রঞ্জনবাবু যে ছেলেবেলায় কিছুকাল বিলেতে ছিলেন সে কথাও ধারণীবাবু জানেন, কিন্তু তার বাইরে আর কিছুই বিশেষ জানেন না।

১৯৫২-তে সেন্ট জেভিয়ার্সে ইন্টারমিডিয়েটে কে কে ছাত্র ছিল তার হদিস পেতে ফেলুদার বিশেষ বেগ পেতে হল না। সেই ছাত্রদের তালিকায় খুব ভাল করে চোখ বুলিয়ে ফেলুদা বলল, এর মধ্যে একজনের নাম চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যদ্দুর মনে হয়। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি করেন। বাড়ি ফিরে এসে বলল, তোপ্‌সে, ডাক্তার হীরেন বসাকের নামটা ডিরেক্টরিতে বার করে ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বারটা আমায় দে তো।

আমি দু মিনিটে কাজটা সেরে দিলাম। ফেলুদা সেই নম্বরে ফোন করে একটা অ্যাপায়েন্টমেন্ট চাইল। ডাক্তার ফেলুদার নাম শুনেই হয়তো পরদিন সকালেই সময় দিয়ে দিলেন–সাড়ে এগারোটা।

কেস কেমন যাচ্ছে খবর নিতে পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসেছিলেন। আমরা তাঁর গাড়িতেই ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম।

ওয়েইটিং রুমে ভিড় দেখেই বোঝা যায় ডাক্তারের পসার ভাল। ডাক্তারের সহকারী আসুন, আসুন বলে ফেলুদাকে একেবারে আসল ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল; পিছন পিছন অবশ্য আমরা দুজনও ঢুকলাম।

ডাক্তার বসাক ফেলুদাকে দেখে হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কী ব্যাপার? আপনার তো বড় একটা ব্যারাম-ট্যারাম হয় না।

ব্যারাম না, ফেলুদা হেসে বলল। একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

কী প্রশ্ন।

আপনি কি সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র ছিলেন?

হ্যাঁ, তা ছিলাম।

আমার আসল প্রশ্নটা হল—এই দুটি ছেলেকে কি চিনতে পারছেন?

ফেলুদা পকেট থেকে সেলোফেনে মোড়া ছবিটা বার করে ডাক্তার বসাকের হাতে দিল। এক দিনের মধ্যেই ছবিটার কপি করিয়ে নিয়ে আসল ছবিটা ফেলুদ রঞ্জনবাবুকে ফেরত দিয়ে এসেছে। ডাক্তার ভুরু কুঁচকে ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, এদের মধ্যে একজন তো মনে হয় আমাদের সঙ্গে পড়ত। রঞ্জন। হ্যাঁ, রঞ্জনই তো নাম।

আমি বিশেষ করে অন্যজনের সম্বন্ধে জানতে চাইছি।

ডাক্তার ছবিটা ফেরত দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, অন্যটিকে কস্মিনকালেও দেখিনি আমি।

আপনাদের সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত না?

ডেফিনিটলি না।

ফেলুদা ছবিটা আবার সেলোফেনে মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

আপনি তা হলে বলছেন আপনার ক্লাসের অন্য ছেলেদের জিজ্ঞেস করেও খুব একটা লাভ নেই?

আমার তো মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট।

তাও, আপনি একটা কাজ করে দিলে আমি খুব উপকৃত হব।

কী?

ফেলুদা পকেট থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের তালিকাটা বার করে ডাক্তার বসাককে দেখাল।

এর মধ্যে কারুর বর্তমান খবর জানেন?

আমি বুঝলাম ফেলুদা সহজে ছাড়ছে না।

ডাক্তার তালিকাটার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, একজনের খবর জানি। জ্যোতির্ময় সেন। ইনিও ডাক্তার, তবে অ্যালোপ্যাথ।

কোথায় থাকেন বলতে পারেন?

হেস্টিংস। ঠিকানাটাও আপনি টেলিফোনের বইয়েতেই পেয়ে যাবেন।

থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

গাড়িতে উঠে লালমোহনবাবু বললেন, স্কুল-কলেজের বাইরেও তো বন্ধু হয় মশাই। অ্যাট প্রেজেন্ট আমার যে কজন বন্ধু আছে তাদের কেউই আমার সহপাঠী ছিল না।

এটা ঠিকই বলেছেন, বলল ফেলুদা। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজে ছবি দিয়ে এনকোয়ারি করতে হবে। তবে আগে এই হেস্টিংসের ডাক্তারকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

জ্যোতির্ময় সেন আমাদের অ্যাপিয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন তিন দিন পরে, সকাল সাড়ে নটায়। ফেলুদার নাম শুনেছেন, যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বললেন, আর বললেন উনি দশটায় চেম্বারে যান, তার আগেই আমাদের সঙ্গে কাজটা সেরে নিতে চান। ফেলুদা বলল, আর এটাও জানিয়ে রাখি যে এর সঙ্গে ব্যারামের কোনও সম্পর্ক নেই; ব্যাপারটা আমার একটা তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

লালমোহনবাবুও অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা জেনে নিয়েছিলেন; তাঁর গাড়িতেই আমরা শুক্রবার সকালে ঠিক সাড়ে নটায় হেস্টিংসে জ্যোতির্ময় সেনের বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

এঁর পসার যে ভাল সেটা বাড়ি দেখেই বোঝা যায়। বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে আমাদের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসবেন।

লালমোহনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কার বিষয় জানতে চাইবেন– রঞ্জন মজুমদার, না ছবির অন্য ছেলেটি?

ফেলুদা বলল, রঞ্জন মজুমদার লোকটাকে একটু ভাল করে জানা দরকার। এখন পর্যন্ত খুবই সামান্য জানি। তাঁর বন্ধুর বিষয় এই ডাক্তার কিছু বলতে পারবেন বলে মনে হয় না।

ফেলুদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতির্ময়বাবু এসে গেলেন।

আপনি তো প্রদোষ মিত্র, বললেন ভদ্রলোক সোফায় বসে। অবিশ্যি ফেলুদা নামেই বেশি। প্রসিদ্ধ। ইনি তো তোপ্‌সে, বুঝতেই পারছি, আর ইনি নিশ্চয়ই জটায়ু। আপনার তদন্তের সব কাহিনী আমার বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই পড়ে, তাই আপনাকে একরকম আত্মীয় বলেই মনে হয়। বলুন, কী প্রয়োজন আপনার।

এই ছবির দুজনের একজনকেও চেনেন?

এ তো দেখছি রঞ্জন মজুমদার। পরিষ্কার মনে পড়ছে। এ চেহারা। এই দ্বিতীয় ছেলেটাকে চিনলাম না।

কলেজে আপনাদের ক্লাসে ছিল না?

উঁহু-তা হলে মনে থাকত।

তা হলে এই রঞ্জন মজুমদার সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্ন করব।

কলেজে রঞ্জন আমার ইন্টিমেট বন্ধু ছিল। আমরা দুজনে এক বেঞ্চে বসতাম, একসঙ্গে সিনেমা দেখতাম। ও আমার হয়ে প্রক্সি দিত, আমি ওর হয়ে দিতাম। অবিশ্যি এখন আর কোনও যোগাযোগ নেই।

কীরকম ছেলে ছিলেন তিনি? অর্থাৎ, মানুষ হিসেবে কীরকম?

জ্যোতির্ময় সেন ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, একটু খ্যাপাটে গোছের। অবিশ্যি সেটা আমি মাইন্ড করতাম না।

খ্যাপাটে কেন বলছেন?

কারণ ওই বয়সে অতি স্ট্রং ন্যাশনালিস্ট ফিলিং আমি কারুর মধ্যে দেখিনি! এটা মনে হয় ওর ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পাওয়া। রঘুনাথ মজুমদার। ইয়াং বয়সে টেররিস্ট দলে ছিলেন, বোমা-টোমা তৈরি করতেন। রঞ্জনের বাবার মধ্যেও বোধহয় এ জিনিসটা ছিল। বিলোতে ডাক্তারি করতেন। কোন এক সাহেবের সঙ্গে বনেনি বলে আবার দেশে ফিরে আসেন।

বিলেতে থাকার সময় রঞ্জনবাবু তো ওখানকার স্কুলে পড়তেন।

তা পড়ত হয়তো, কিন্তু সে সম্বন্ধে ও নিজে কিছুই বলেনি। ওর তো ওখানে একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডোন্ট হয়-সে বিষয় জানেন বোধহয়?

হ্যাঁ। উনি নিজেই বলেছিলেন।

তার ফলে ও পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা একদম ভুলে যায়। অর্থাৎ বিলেতের সব ঘটনাই ওর মন থেকে লোপ পেয়ে যায়।

তা হলে ওখানে কার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল না-হয়েছিল সেটাও জানবার কোনও উপায় নেই?

না। যদি না ঘটনাচক্রে স্মৃতি আবার ফিরে আসে। তবে এটা বলে রাখি-রঞ্জন খুব সাধারণ ছেলে ছিল না। অসুখে ওর কী ক্ষতি করেছিল জানি না-বা ইংল্যান্ডের ছাত্র অবস্থা ওর কীরকমভাবে কেটেছে জানি না, কিন্তু ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেটা ওই বয়সেও বোঝা যেত।

পরদিন সকালে টেলিফোনে আপয়েন্টমেন্ট করে আমি আর ফেলুদ রঞ্জন মজুমদারের বাড়ি গেলাম। কদ্দূর এগোলেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

এই ছেলেটি যে কলকাতায় আপনার সহপাঠী ছিল না সেটা জানতে পেরেছি। এবার একটা স্টেপ নেব ভাবছি। যেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এবং আপনার অনুমতি চাই।

কী স্টেপ?

এই ছবি থেকে অচেনা ছেলের ছবিটা খবরের কাগজে ছাপতে চাই—একটা বিজ্ঞাপনে। কলকাতা আর দিল্লির কাগজে দিলেই হবে।

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন, আমার নামের কোনও উল্লেখ থাকবে না তো?

মোটেই না, বলল ফেলুদা। আমি শুধু জানতে চাই এই ছেলের পরিচয় কেউ জানে কি না। যদি জানে তা হলে আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে! আমার নাম-ঠিকানা থাকবে।

ঠিক আছে। আপনার ইনভেস্টিগেশনের জন্য যা যা করার দরকার সে তো আপনাকে করতেই হবে! আমার কোনও আপত্তি নেই।

৩. দিল্লির স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন

পাঁচ দিন পরে রবিবারে কলকাতা আর দিল্লির স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপনটা বোরোল।

প্রথম দিন কোনও ফলাফল নেই, কেউ যোগাযোগ করল না।

বোঝাই যাচ্ছে কলকাতার কেউ নয়; তা হলে এর মধ্যে টেলিফোন এসে যেত, বলল ফেলুদা।

বুধবার সকালে ফেলুদার একটা ফোন এল। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে। জন ডেক্সটর বলে একজন টুরিস্ট। তিনি একটা অস্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দিল্লিতে এসে আচমকা কাগজে ছবিটা দেখেই স্থির করেছিলেন কলকাতায় এসে ফেলুদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বললেন আজই বিকেলে কাঠমাণ্ডু চলে যাচ্ছেন, দুপুর একটা নাগাত আমাদের বাড়ি আসতে পারেন।

ফেলুদা অবশ্যই হাঁ বলল। সে বেশ উত্তেজিত। বিজ্ঞাপনের যে কোনও ফল হবে সেটা ও আশা করেনি।

একটার কাছাকাছি একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল! ফেলুদা দরজা খুলল! ট্যাক্সি থেকে নেমে এক বছর পঞ্চাশের সাহেব ফেলুদার দিকে এগিয়ে এল।

মিস্টার মিটার?

ইয়েস-প্লিজ কাম ইনি।

ভদ্রলোক ভিতরে এসে ঢুকলেন। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে একটা বাদামি রঙে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝাই যায়। ভদ্রলোক বেশ কিছু দিন হল ভারত দর্শন করে বেড়াচ্ছেন।

ভূদ্রলোক বসার পরে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, আপনি কাগজের ছবিটা দেখেছেন?

সেটা দেখেছি বলেই তো আসছি। অ্যাদ্দিন পরে আমার খুড়তুতো ভাই পিটার ডেক্সটরের ছবি কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখে অবাক লাগল।

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত যে এটা আপনার খুড়তুতো ভাইয়ের ছবি?

হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমি খুব অল্প বয়সে অষ্ট্রেলিয়া চলে যাই। তারপরে আর পিটারের খবর রাখিনি। ইন ফ্যাক্ট, আমার ফ্যামিলির সঙ্গেও আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই ওরা এখন কে কী অবস্থায় আছে তা বলতে পারব না। এইটুকু মনে আছে যে পিটারের বাবা-আমার কাকা-মাইকেল ডেক্সটার ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। আমার মনে হয়। ইনডিপেনডেন্সের পরে উনি আবার দেশে ফিরে যান।

পিটারই কি ওঁর একমাত্র ছেলে ছিল?

ওঃ নো! সবসুদ্ধ সাতজন সন্তান ছিল মাইকেল ডেক্সটরের! পিটার ছিল ষষ্ঠ! বড় ছেলে জর্জও ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল।

মাইকেল ডেক্সটর বিলেতে কোথায় থাকতেন?

কাউন্টিটা মনে আছে। নরফোক! শহরের নাম মনে নেই।

এতেও অনেক কাজ হল।

জন ডেক্সটর উঠে পড়লেন। তাঁকে হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেতে হবে। –তাঁর দলের লোক সব অপেক্ষা করছে। ফেলুদা ভদ্রলোককে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

পরদিন আবার অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে আমরা রঞ্জন মজুমদারের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। বিজ্ঞাপনের কোনও ফল পেলেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

সেইটে জানাতেই আপনার কাছে আসা, বলল ফেলুদা। ছেলেটি ব্রিটিশ, নাম পিটার ডেক্সটার।

কী করে জানলেন?

ফেলুদা জন ডেক্সটরের ঘটনাটা বলল।

রঞ্জনবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে দুবার বললেন, পিটার ডেক্সটর...পিটার ডেক্সটর...

কিছু মনে পড়ছে কি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আবছা আবছা। একটা দুর্ঘটনা...না, এই স্মৃতির ওপর নির্ভর করা চলে না।

আপনি যে-সময়ের কথা ভুলে গেছেন, সেই সময়ের ঘটনা কি মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়?

যা মনে পড়ে সেটা সত্যি কি না। কী করে বিচার করব? এমন তো কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করে যাচাই করতে পারি। বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। আমার বিলেতের ঘটনা ওঁরাই জানতেন?

একটা জিনিস বোধহয় বুঝতে পারছেন, যে কলকাতায় বসে এই পিটার ডেক্সটর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যাবে না।

হ্যাঁ...হাঁ... তা তো বুঝতেই পারছি...

ভদ্রলোক আবার অন্যমনস্ক।

না কি ব্যাপারটা এখানেই ইতি দেবেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠলেন।

মোটেই না—মোটেই না। হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন রঞ্জন মজুমদার। সে কোথায় আছে কী করছে, আমাকে মনে আছে কি না—সব আমি জানতে চাই। আপনি কবে যেতে পারবেন?

হঠাৎ এই প্রশ্নে যেন ফেলুদা একটু হকচাকিয়ে গেল। বলল, কোথায়?

লন্ডন—আবার কোথায়? লন্ডন তো আপনাকে যেতেই হবে।

হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি।

কবে যাবেন?

আমার তো অন্য কোনও কাজ নেই। এটাই একমাত্র কেস।

আপনাদের পাসপোর্ট-টাসপোর্ট হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। আমরা কয়েক বছর আগে হংকং যাই; তখনই করিয়ে নিয়েছিলাম।

তা হলে আর কী—বেরিয়ে পড়ুন। আমি টিকিটের ব্যবস্থা করছি।

আমাদের সঙ্গে এক বন্ধু যাবেন—নিজের খরচে অবশ্য।

ঠিক আছে—তাঁর নাম আমার সেক্রেটারি পশুপতিকে দিয়ে দেবেন। পশুপতিই আমার ট্র্যাভল এজেন্টের খুঁ দিয়ে আপনাদের যাবার এবং ওখানে থাকার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটা তো আছে; সেটাও ও করে দেবে।

ওখানে কদ্দিন থাক?

রঞ্জনবাবু একটু ভেবে বললেন, সাত দিনে যদি হল তো হল, না হলে চলে আসবেন। আমি রিটার্ন বুকিংটাও সেইভাবেই করব।

আমি যদি সাকসেসফুল না হই, তা হলে কিন্তু আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে প্রস্তুত নই।

আপনি কোনও কেসে বিফল হয়েছেন?

তা হইনি।

তা হলে এটাতেও হবেন না।

৪. লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া

ইউ. কে?

লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ফেলুদা ভদ্রলোককে কলকাতার ঘটনা সব বলে দিয়ে তারপর লন্ডনের ব্যাপারটা বলল। ভদ্রলোক এটার জন্য একেবারেই তৈরি ছিলেন না।

আপনি গেলে কিন্তু আপনার নিজের খরচে যেতে হবে। আমাদের খরচ মিস্টার মজুমদার দিচ্ছেন।

কুছ পরোয় নেহি। খরচের ভয় আমাকে দেখবেন না, মিস্টার হোমস। আপনার পসার বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও আমার রোজগার আপনার চেয়ে বেশি। শুধু বলে দিন কী করতে হবে।

দিন সাতেকের মতো গরম কাপড় নেবেন। পাসপোর্টটা হারাননি তো?

নো স্যার-কেয়ারফুলি কেপট ইন মাই অ্যালমাইরা।

তা হলে আর আপনার করণীয় কিছু নেই। যাবার তারিখটা যথাসময়ে জানতে পারবেন। যদ্দুর মনে হয়-এখান থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লন্ডন!

ওখানে থাকছি কোথায়?

সেটা রঞ্জনবাবুর ট্র্যাভল এজেন্ট ব্যবস্থা করবে। একটা থ্রি-স্টার হোটেল হবে। আর কী।

হোয়াই ওনলি থ্রি স্টারস?

তার চেয়ে বেশি চড়তে গেলে মজুমদার মশায়ের পকেট ফাঁক হয়ে যাবে। লন্ডনের খরর সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার?

তা অবিশ্যি নেই। তবে, একটা কথা বলে রাখি-গড়পারে এক ভদ্রলোক থাকেন, আমার খুব চেনা। চন্দ্রশেখর বোস। ব্যবসাদার। বছরে দুবার করে বিলেত যান। তাঁর কাছ থেকে কিছু ডলার ম্যানেজ করব। –কী বলেন?

ব্যাপারটা কিন্তু বেআইনি। অতএব নীতিবিরুদ্ধ।

আরে মশাই আপনি অতি সাধুগিরি করবেন না তো। আজকাল নীতির ডেফিনিশন চেঞ্জ করে গেছে।

ঠিক আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার কারচুপিতে সায় দিচ্ছি।

আমাদের মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়াতে যাওয়া ঠিক হল। প্লেন ছাড়বে রাত তিনটেয়, তারপর বম্বে হয়ে লন্ডন পৌঁছাবে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায়। হোটেলের বুকিং-ও হয়ে গেছে–পিকাডিলি সাকাসে রিজেন্ট প্যালেস। ফেলুদা বলল, খুব ভাল লোকেশন। একেবারে শহরের মাঝখানে! ফেলুদা ক'দিন থেকে লন্ডন সংক্রান্ত গাইড বুকে ডুবে আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরের ম্যাপ দেখছে।

যাবার আগের দিন মিস্টার মজুমদারকে ফোন করা হল। মিনিট দুয়েক কথা বলে ফোন নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলল, জানতে চেয়েছিলাম ওঁর বাবা কোনও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হলেন কি না। বললেন ওঁর মনে নেই। ওঁরা কোথায় থাকতেন জিজ্ঞেস করাতেও একই উত্তর পেলাম! বললেন ওঁর বাবা ওঁকে বলেছিলেন। কিন্তু এখন আর মনে নেই। আমার মনে হয়। অ্যাকসিডোন্টটা ওঁর স্মৃতিশক্তিকেই দুর্বল করে দিয়েছে। লন্ডনে আমার কলেজের এক সহপাঠী আছে, সে-ও ডাক্তার। দেখব ওর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায় কি না।

দেখতে দেখতে যাবার দিন চলে এল। ফেলুদার দৌলতে কত জায়গাই না দেখলাম, কিন্তু লন্ডন যাওয়া হবে এটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। লালমোহনবাবু বললেন, বিলেত আজকাল রাম শ্যাম যদু মধুসকলেই যাচ্ছে, সেই ভেবে মনটাকে একটু ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছিলাম-ও মা, কাল রাত্তিরে দেখি পালস রেট বেড়ে একশো দিশে উঠেছে। এমনিতে আশির বেশি কদাচিৎ ওঠে।

এখানে বলে রাখি, লালমোহনবাবু তাঁর গড়পারের বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিছু ডলার ম্যানেজ করেছেন।

ফেলুদাকে ক'দিন থেকে একটু চুপচাপ দেখছি, যদিও কাজ যা করার সবই করছে; কেসটা যে সহজ নয়। সেটাই বোধহয় মাথার মধ্যে ঘুরছে। আমি তো কল্পনাই করতে পারছি না ও কীভাবে এগোবে। তথ্য এত কম। তার ওপরে রঞ্জনবাবুর স্মৃতিলোপ। যে কটা বছর ওই ছেলেটির সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল, সেই কটা বছরের কথাই উনি ভুলে বসে আছেন। লালমোহনবাবু সোজাসুজি বললেন, আপনি অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন, কিন্তু এটার মতো কঠিন কেস তার কখনও আপনার হাতে এসেছে বলে তো মনে হয় না। আপনি যে কেসটা কেন নিলেন তা বুঝতে পারছি না।

এটা নিলাম বলেই কিন্তু আপনার বিলেত যাওয়া হচ্ছে।

তা বটে, তা বটে।

যাবার দিন এবং তারপর যাবার সময়ও এসে পড়ল। লালমোহনবাবুর গাড়িতেই এয়ারপোর্ট গেলাম। ভদ্রলোক পুরোদস্তুর সাহেব সেজেছেন। এই টাইটা আগে দেখিনি, বুঝলাম নতুন কিনেছেন।

কাস্টমাসের ঝামেলা এখানেই চুকিয়ে দিয়ে বম্বে পৌঁছে লাগেজ জমা দিয়ে লাউঞ্জে কিছুটা সময় অপেক্ষা করে, লাউডস্পিকারের ঘোষণা শুনে আমরা প্লেনে গিয়ে উঠলাম। আশ্চর্য– এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমোনের কথা, কিন্তু যাবার উত্তেজনায় একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

লালমোহনবাবু নাকি দুপুরে এক দফা ঘুমিয়ে নিয়েছেন, তাই বললেন প্লেনে আর ঘুমোনোর দরকার হবে না। ভদ্রলোক নিজের জায়গায় বসে বেল্ট বেঁধে বললেন, সেই পঞ্চুলালের গল্পে পড়েছিলাম না-তিমি মাছের পেটে ঢুকেছিল পঞ্চ–এও যেন সেই তিমি মাছের পেট। এত লোক সমেত প্লেনটা মাটি থেকে ওঠে কী করে সেটাই আশ্চর্য।

সেই আশ্চর্য ঘটনাটাও ঘটে গেল। রানওয়ে দিয়ে যখন প্লেন কান-ফাটানো শব্দ করে ছুটে চলেছে, লালমোহনবাবুর চোখ তখন বন্ধ। ঠোঁটটা একবার নড়ে উঠল, আর বুঝলাম যে উনি বললেন দুগ্ধ দুগ্ল, আর সেই মুহূর্তে প্লেনটা জমি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল, জানালা দিয়ে দেখলাম বম্বের আলো দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর প্লেনটা ক্রমে নাক উঁচু অবস্থা থেকে সোজা হল, শব্দ কমে গেল, আর লাউডস্পিকারে এয়ার হোস্টেসকে বলতে শোনা গেল আমরা এখন বেল্ট খুলতে পারি, তবে আলগা করে পরে থাকাই ভাল। তারপর এক দিকে একজন ছেলে আমার অন্য দিকে একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে লাইফ জ্যাকেট আর অক্সিজেনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

আমরা নন-স্মোকিং এরিয়াতে বসেছি। ফেলুদা সিগারেট খায় বটে, কিন্তু দরকার পড়লে অনায়াসে দশ-বারো ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারে। সিনেমা দেখাবে না? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, সচরাচর তো দেখায় বলেই শুনেছি।

সিনেমা দেখাল ঠিকই, সেই সঙ্গে কথা শোনার জন্য একটা করে হেডফোন দিলে, কিন্তু এত বাজে ছবি যে আমি দশ মিনিট দেখে হেডফোন খুলে রেখে ঘুম দিলাম।

ঘুমটা যখন ভাঙল তখন জানালা দিয়ে রোদ আসছে। ফেলুদাও বলল ও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেব।

বরফে ঢাকা আলপসের উপর দিয়ে প্লেনটা না উড়ে গেলে প্রায় কিছুই দেখার থাকত না। পাহাড়টার নাম জেনে লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি মন্ট ব্ল্যাঙ্ক দেখতে পাব? ফেলুদা বলল, তা পাব, তবে মন্ট ব্ল্যাঙ্ক নয়, লালমোহনবাবু। এখন ইউরোপে

এসেছেন, এখানকার দ্রষ্টব্যগুলোর নামের উচ্চারণ ঠিক করে করতে শিখুন। ওটা হল ম ব্লাঁ।

তার মানে অনেকগুলো অখকরের কোনও উচ্চারণই নেই?

ফরাসিতে সেটা খুব স্বাভাবিক।

লালমোহনবাবু বেশ কয়েকবার মা ব্লাঁ ম ব্লাঁ বলে নিলেন।

আর আমাদের হোটেল যেখানে, বলল ফেলুদা, সেটার বানান দেখে পিকাডিলি বলতে ইচ্ছা করলেও আপনি যদি পিক্‌লি বলেন তা হলে ওখানকার সাধারণ লোকে বুঝবে আরও সহজে। পিক্‌লি সার্কাস।

পিক্‌লি সার্কাস। থ্যাঙ্ক ইউ।

আধা ঘণ্টা লেটে আমাদের প্লেন লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। ফেলুদা বলল, এখান থেকে সেন্ট্রাল লন্ডন তিনরকমে যাওয়া যায়। এক হল বাস, দুই হল ট্যাক্সি আর তিন টিউব। ট্যাক্সিতে দেদার খরচা, আর বাসের চেয়ে টিউবে কম সময় লাগে। আমার ম্যাপ বলছে একেবারে পিকাডিলি সার্কাস পর্যন্ত টিউব যায়, কাজেই তাতেই যাওয়া ভাল।

টিউবটা কী ব্যাপার মশাই? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

টিউব হল কলকাতায় আমরা যাকে মেট্রো বলি, সেই। অর্থাৎ পাতাল রেল। লন্ডনের নীচ দিয়ে কিলবিল করে ছড়ানো রয়েছে এই টিউবের লাইন। একবার বুঝে নিলে টিউবে যাতায়াতের মতো সহজ জিনিস আর নেই। ম্যাপ পাওয়া যায়; একটা আপনাকে এনে দেব।

৫. আমাদের হোটেলটা বেশ বড়

আমাদের হোটেলটা বেশ বড় আর পরিচ্ছন্ন, অথচ ভাড়া খুব বেশি নয়। ট্র্যাভল এজেন্ট ভালই চয়েস করেছিল মশাই বললেন লালমোহনবাবু। টিউব থেকে বেরিয়ে শহরের চেহারা দেখে প্রথমে ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছিল না। শেষে বললেন, আচ্ছা মশাই, আমাদেরও লাল ডবল ডেকার, আর এখানেও দেখছি লাল ডবল ডেকার, এগুলো কেমন ছিমছাম, আর আমাদেরগুলো এমন ছিবড়ে চেহারা কেন বলুন তো?

লাঞ্চ হোটেলে সেরে ফেলুদা বলল, তোরা যদি খুব টায়ার্ড না বোধ করিস তা হলে একবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটটা ঘুরে দেখে আয়। ব্যস্ত লন্ডনের এমন চেহারা আর কোথাও পাবি না।

আর তুমি কী করবে?

বলছিলাম না—আমার এক কলেজের বন্ধু—বিকাশ দত্ত—এখানে ডাক্তার। তাকে একবার ফোন করে জানিয়ে দিই। আমি এসেছি, আর দেখি যদি ও কোনও ইনফরমেশন দিতে পারে।

আমরা অবিশ্যি তেমন কিছু ক্লান্ত হইনি, তাই বেরোনোই স্থির করলাম।

ফোন করে তার বন্ধুকে পেয়ে গেল ফেলুদা। মিনিটখানেক কথা বলে ফোন রেখে বলল, বিকাশ আমার গলা শুনে একেবারে থা। একটা মামলা যে কোনওদিন আমাকে লন্ডনে এনে ফেলবে সেটা ও ভাবতেই পারেনি। তা ছাড়া ওর কাছ থেকে একটা খবরও পাওয়া গেল।

কী খবর? লিন্ডনে এক বৃদ্ধ বাঙালি ডাক্তার আছেন, তিনি নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই এখানে আসেন ডাক্তারির ছাত্র হয়ে। তারপর লন্ডনে প্র্যাকটিস করেন। নাম

নিশানাথ সেন। খুব মিশুকে লোক। বিকাশের ধারণা উনি হয়তো রঞ্জনবাবুর বাবাকে চিনতেন। ওঁর চেম্বারের ঠিকানাটা দিয়ে দিল। আমি একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ফেলুদা উঠে পড়ল।

অন্ধকারে ঢিল। যদি ছুড়তেই হয়, তা হলে সেটা এখনই আরম্ভ করে দেওয়া ভাল।

আমরা একসঙ্গেই বেরেলাম। ফেলুদা টিউব স্টেশনের দিকে গেল, আমরা ওর কাছ থেকে ডিরেকশন নিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে হাঁটা দিলাম।

অক্টোবর মাস, তাই বেশ ঠাণ্ডা। আমরা দুজনেই গলায় মাফলার জড়িয়ে নিয়েছি।

পথে অনবরত ভারতীয় চোখে পড়ছে, তাই বোধহয় জটায়ু বললেন, বেশ অ্যাট-হাম ফিল করছি ভাই তপেশ। অবিশ্যি রাস্তায় মসৃণ চেহারা মোটেই হামের কথা মনে পড়ায় না।

অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পৌঁছে চোখ টেরিয়ে গেল। শুধু যে দোকানের বাহার তা নয়; এরকম ভিড় আর কোনও রাস্তায় কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

জনসমুদ্র! ওশন অফ হিউম্যানিটি, তপেশ, ওশন অফ হিউম্যানিটি।

এই জনসমুদ্রের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হচ্ছে, তাই আস্তে হাঁটার উপায় নেই। সমস্ত রাস্তাটাই যেন একটা অবিরাম ব্যস্ততার ছবি। আর দোকানের কথা কী আর বলব! ঝলমলে লোভ লাগানো চেহারা নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর। নামগুলো পড়ছি। –ডোবনহ্যাঁম, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসরস, বুটস, ডি এইচ এভানস...

একটা বড় দোকানের কথা আমি আগেই জানতাম-সেলফ্রিজেস। –আর এটাও জানতাম যে সেটা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একেবারে শেষ প্রান্তে। দোকানটা যে এত বড় সেটা আমি

ভাবতেই পারিনি। চলুন, একটা জিনিস দেখাই বলে। লালমোহনবাবুকে হাত ধরে রাস্তা পার করে সেলফ্রিজেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর ঘুরপাক খাওয়া দরজা দিয়ে দুজনে দোকানের ভিতর ঢুকলাম। আমাদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। রাজ্যের সবরকম জিনিস এই এক দোকানে পাওয়া যায়, তাই ক্রেতাদের ভিড়ও দেখবার মতো। সেই ভিড়ের চাপে এদিকে ওদিকে। টলছি, এক পা এগোচ্ছি। তো দু পা পেছোচ্ছি। জটায়ু যাতে হারিয়ে না যান। তাই তাঁর হাতটা চেপে ধরে আছি।

মানুষেরও যে ট্র্যাফিক জ্যাম হয় তা এই প্রথম দেখলাম, বললেন ভদ্রলোক।

খানিক দূর এগিয়ে একটা মোটামুটি কম ভিড়ের জায়গায় পৌঁছলাম।

এমন জায়গায় এসে কিছু না কিনে ফিরে যাব? বললেন লালমোহনবাবু।

কী, কিনতে চাইছেন আপনি?

চারিদিকে তো দেখছি কলম পেনসিল নেটবুকের সম্ভার। একটা মাঝারি দামের ফাউন্টেন পেনিও যদি কিনতে পারতাম। সামনের উপন্যাসটা লন্ডনে কেনা। কলমে লিখতে পারলে...

বেশ তো, আপনি দেখে বেছে নিন।

মিনিট পাঁচেক দেখার পর ভদ্রলোক একটা মনের মতো কলম খুঁজে পেলেন। থ্রি। পাউন্ডস থার্টি পেন্স। তার মানে আমাদের দেশের হিসেবে কত হল?

তা প্রায় পঁচাত্তর টাকা।

গুড। এই জিনিসের কলকাতায় দাম হত দুশো।

আর কী–পেমেন্ট করে দিন।

কী বলব বলো তো? মানে, প্রথম দিন তো, একটু গাইডেন্স না পেলে...

আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। কলমটা নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে দিন আরএকটা পাঁচ পাউন্ডের নোট দিন। ওরা চেঞ্জ ফেরত দেবে, আর কলমটা ওদের একটা খামে পুরে দেবে। ব্যস, খতম!

তুমি প্রথম দিন এত কী করে জানলে বলে তো?

আমি তো এসে অবধি চতুর্দিকে দেখছি। আপনিও দেখছেন, কিন্তু আপনি অবজার্ভ করছেন না।

দু মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক তার নতুন কেনা কলম নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এলেন আমি বললাম চা খাবেন?

কোথায়?

আমি যত দূর জানি, ওপরে একটা রেস্টোরান্ট আছে।

বেশ তো, চলে যাওয়া যাক।

চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে চার তলায় খাবার জায়গাটা আবিষ্কার করলাম, আর সেই সঙ্গে ভাগ্যক্রমে একটা খালি টেবিলও পেয়ে গেলাম।

চা খাওয়া শেষ করে আবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটের জনসমুদ্র পেরিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সাড়ে চারটা বেজে গেছে। ঘরে গিয়ে দেখি ফেলুদা হাজির।

বিলেত ব্যাপারটা কী তার কিছু আন্দাজ পেলেন?

লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

কেমন লাগল বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

কেন, আপনার বই পড়ে তো মনে হয় আপনার বিশেষণের স্টক অফুরন্ত।

বাংলায় বোঝাতে পারব না। বলতে হয় সুপার-সেনসেশনাল। এখনও মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। বিশ্রী দেটানার মধ্যে পড়ে গেছি।

কেন?

লন্ডন দেখব, না আপনার তদন্তের প্রোগ্রেস দেখব।

তদন্ত তো সবে শুরু। তেমন জমে উঠলে আমি নিজে থেকেই বলব। আপাতত লন্ডন দেখে নিন।

সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হল, তবে কথা প্রায় কিছুই হল না। ভদ্রলোক রুগি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কাল সকালে ওঁর বাড়ি যেতে বলেছেন। রিচমন্ডে থাকেন।

সেটা কোথায়?

পিকাডিলি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে রওনা হয়ে সাউথ কেনসিংটনে চেঞ্জ করে গ্রিন লাইন ধরে সোজা রিচমন্ড। এ ধরনের জায়গাও তো দেখা দরকার। ভদ্রলোক স্টেশনের বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য। বেশ অমায়িক লোক। রঞ্জনবাবুর বাবাকে চিনতেন এটুকু জেনেছি।

হোটেলের ঘরে ঘরে টেলিভিশন, তাই দেখেই সন্ধেটা দিব্যি কেটে গেল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম, আর বালিশে মাথা রাখতেই চোখ ঘুমে ঢুলে এল।

৬. আকাশ মেঘলা

পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘলা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমার একটা ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট ছিল, সেটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দুজনেই ম্যাকিনটশ চাপিয়েছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ফেলুদা বলল, মিস্টার জটায়ু, আপনাকে বলে রাখি যে এটাই হল লন্ডনের স্বাভাবিক চেহারা। কাল যে খটখটে দিন আর ঝলমলে রোদ পেয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম।

এখানে কলকাতার মতো জল জমে না নিশ্চয়ই।

তা জমে না। আর খুব যে মুষলধারে বৃষ্টি হয় তাও নয়।

আন্ডারগ্রাউন্ডে দেখি সকলেরই তাড়া, কেউ আস্তে হাঁটছে না। আমরাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললাম।

এই স্পিডটা দেখছি ছোঁয়াচো, বললেন লালমোহনবাবু। কলকাতায় এমন রুদ্ধশ্বাসে হাটবার কথা কল্পনাই করতে পারি না।

চেঞ্জ করার সময়ও সেই একই তাড়া। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে যেতে হচ্ছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন আসছে যাচ্ছে, সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য লোকে উঠে পড়ে লেগেছে।

রিচমন্ড পৌঁছলাম। এগারোটা বেজে পাঁচে। নিশানাথবাবু বলে দিয়েছিলেন হাতে কত সময় রাখতে হবে, তাই কোনও অসুবিধা হল না।

স্টেশনের বাইরে বেরোতেই একজন ষাট-বাষট্টি বছরের সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক হাসিমুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, যদিও আকাশে মেঘ।

ওয়েলকাম টু রিচমন্ড।

ফেলুদা ভদ্রলোককে সম্ভাষণ জানিয়ে আমাদের দুজনের পরিচয় দিয়ে দিল।

আপনি রাইটার? লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। কতকাল যে বাংলা বই পড়িনি তার হিসেব নেই।

আপনি দেশে যান না মাঝে মাঝে? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

লাস্ট গেছি সেভেনটি থ্রিতে। তারপর আর না। কার জন্যেই বা যাব বলুন। আমার পুরো ফ্যামিলিই তো এখানে। আমার বাড়িতে অবিশ্যি আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ থাকে না, কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই ইংল্যান্ডেই রয়েছে আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি-নাতনি।

ভদ্রলোকের গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করা ছিল; বললেন, এখানে তবু কম; লন্ডনে গাড়ি পার্কিং হচ্ছে একটা বিরাট সমস্যা। আপনি হয়তো সিনেমা যাবেন, গাড়ি পার্ক করতে হবে সিনেমা হাউস থেকে আধ মাইল দূরে।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। ভদ্রলোক নিজেই ড্রাইভ করেন, ফেলুদা ওঁর পাশে বসে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিল। ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হয়ে লালমোহনবাবু আমার দিকে চাইতে বললাম, এখানে গাড়িতে সামনের সিটে বসলে স্ট্র্যাপ লাগানো নিয়ম।

কেন?

যাতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে লোকে মুখ থুবড়ে না পড়ে।

নিশানাথবাবু গাড়ি চালু করে দিয়ে বললেন, আমার বাড়ি এখান থেকে দেড় মাইল। এখানে এখনও মাইল চলে। দেশে তো কিলোমিটার, কিলোগ্রাম হয়ে গেছে, তাই না?

রিচমন্ড যে খুব ছোট জায়গা তা মনে হল না, কারণ দোকানপাট সবই রয়েছে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে যে সব দোকানের নাম দেখেছিলাম, তার কিছু কিছু এখানেও দেখলাম।

নিশানাথ সেনের বাড়ি একটা সুন্দর নিরিবিলি জায়গায়, চারিদিকে গাছপালা, গাছের পাতায় শরৎকালের হলদে আর বাদামি রং। দোতলা বাড়িটাও সুন্দর, সামনের বাগানে ফুল— একেবারে পোস্টকর্ডের ছবি।

আমরা একতলায় বসবার ঘরে বসলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে, তাই ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে।

আমরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয়স্ক মেমসাহেব এসে ঢুকলেন, মুখে হাসি।

আমার স্ত্রী এমিলি, বললেন নিশানাথবাবু। আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলাম।

আপনাদের জন্য একটু কফি করি? মহিলা জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা সম্মতি জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দিল। এবার নিশানাথবাবুও ফেলুদার সামনে একটা কাউচে বসে বললেন, কী জানতে চান বলুন।

আপনি কাল বলছিলেন রঞ্জন মজুমদারের বাবাকে চিনতেন। আমি রঞ্জন মজুমদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি।

রঞ্জনের বাপ রজনী আর আমি প্রায় একই সঙ্গে ফটি এইটে বিলোতে আসি। ও আমার চেয়ে ষোল-সতেরো বছরের বড় ছিল। আলাপটা হয়। পরে। তত দিনে আমি এডিনবরায় ডাক্তগরি পাশ করে লন্ডনে প্র্যাকটিস শুরু করেছি, আর রজনী মজুমদার সেন্ট মেরিজ হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচিড রয়েছেন। একটা থিয়েটারে আমাদের পাশাপাশি সিটি

পড়েছিল। কী নাটক তাও মনে আছে—মেজর বারবারা। ইন্টারমিশনে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওর সঙ্গে ওর। স্ত্রীও ছিলেন। ও থাকত গোলডার্স গ্রিনে, আর আমি—তখনও আমার বিয়ে হয়নি-হ্যাম্পাস্টেডে।

আর ওঁর ছেলে?

ছেলেও এখানে এসে কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলে ভর্তি হয়।

কী স্কুল মনে আছে?

আছে বইকী—ওয়ারেনডেল। এপিং-এ। তারপর কেমব্রিজে যায়।

কোন কলেজ?

যদ্দুর মনে পড়ে—ট্রিনিটি। সেই সময়ই আমার সঙ্গে রজনী মজুমদারের আলাপ।

কীরকম লোক ছিলেন রজনী মজুমদার?

নিশানাথবাবু একটু ভেবে বললেন, পিকিউলিয়ার।

কেন—পিকিউলিয়ার বলছেন কেন?

আমার মনে হয়। ওদের পুরো ফ্যামিলিটাই একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। রজনী মজুমদারের বাবা রঘুনাথ মজুমদার ইয়াং বয়সে টেররিস্ট ছিলেন, বোমা-টামা তৈরি করেছেন। পরে উনি নামকরা হার্ট স্পেশালিস্ট হন। তখন আর সাহেবদের ওপর কোনও বিদ্বেষ নেই। এমনকী তিনিই জোর করে রজনীকে বিলেত পাঠান। তাঁর শখ তাঁর নাতি সাহেব ইস্কুলে পড়বে। আর ছেলে লন্ডনে প্র্যাকটিস করবে। এরকম রূপান্তর বড় একটা দেখা যায় না। আর রজনী যে ভাবে দেশে ফিরে গেল সেও অদ্ভুত। ওর একটা ধারণা ছিল যে ইংরেজরা এখনও ভারতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে। আমি ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ব্যাপারটা সত্যি নয়। এই বিদ্বেষের দু-একটা আইসোলেটেড ঘটনা হয়তো ঘটে থাকতে

পারে, কিন্তু এখানে বহু ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে, দুই জাতের মধ্যে কোনও ক্ল্যাশ নেই।

কিন্তু রজনী মজুমদার আমার কথা মানতে রাজি হয়নি। একটা সামান্য ব্যাপারে–ওরই এক ব্রিটিশ পেশেন্টের একটা কথায়–ও হঠাৎ স্থির করে দেশে ফিরে যাবে।

ততদিনে তো ওঁর ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে?

তা গেছে। সেই ছেলে এখন কী করছে? তার তো পঞ্চাশের ওপর বয়স হওয়া উচিত।

হ্যাঁ। উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

তার মানে এখানকার পড়াশুনা ওর কোনওই কাজে লাগেনি? কলকাতায় ফিরে গিয়ে নতুন করে পড়াশুনা করতে হয়?

তই তো মনে হয়। ইয়ে–রঞ্জনের বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে কিছু জানতেন কি?

না। নাথিং অ্যাট অল।

ইতিমধ্যে কফি এসে গিয়েছিল, আর আমাদের খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে। পড়লাম। ভদ্রলোক ফেরার পথেই একরকম জোর করেই আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন।

৭. টিউবে করে এপিং

আমরা পরদিন টিউবে করে এপিং গিয়ে পৌঁছলাম বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ। স্টেশন থেকে হেঁটে ওয়ারেনডেল স্কুলে পৌঁছতে লাগল কুড়ি মিনিট। বিশাল খেলার মাঠের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্কুল বিল্ডিং—অন্তত দুশো বছরের পুরনো তো হবেই। ফেলুদার উদ্দেশ্য হল রঞ্জন মজুমদার ওখানে ছাত্র ছিল কি না, এবং পিটার ডেক্সটর ওর সঙ্গে পড়ত কি না সেইটে জানা।

ইস্কুলের সদর দরজায় পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে, সে জিজ্ঞেস করল। আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ফেলুদা বলল সে চল্লিশ দশকের শেষ দিকের একজন ছাত্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চায়। পোর্টার আমাদের একটা লাইব্রেরি জাতীয় হলে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, মিস্টার ম্যানিং দেয়ার উইল হেলপ ইউ।

ম্যানিং ভদ্রলোকটি একটা ডেস্কে বসে পুরু কাচের চশমা পরে একটা খাতায় কী জানি লিখছিলেন, ফেলুদা তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একটা মৃদু গলা খাঁকরানি দিল। ভদ্রলোক লেখা থামিয়ে চোখ তুলে বললেন, ইয়েস?

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

হুইচ ইয়ার ডিড ইউ সে?

নাইনটিন ফর্টি এইট।

মিস্টার ম্যানিং তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে পিছন দিকে গিয়ে একটা বইয়ের তাক থেকে বেশ বড় এবং মোটা একটা খাতা বার করলেন। তারপর সেটাকে এনে ফেললেন তাঁর ডেস্কে।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, ভদ্রলোক খাতার পাতা উলটিয়ে একটা বিশেষ পাতায় এসে চশমার ওপর দিয়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, হোয়াট নেম ডিড ইউ সে?

আই হ্যাভনট টাল্ড ইউ ইয়েট, বলল ফেলুদা। দ্য নেম ইজ মজুমদার, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট নেম ইজ রঞ্জন।

ম্যাজুমডা, ম্যাজুমডা, নামের তালিকার ওপর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বিড়বিড় করতে লাগলেন মিস্টার ম্যানিং।

হঠাৎ আঙুলটা এক জায়গায় এসে থেমে গেল।

ইয়েস আর. ম্যাজুমডা, বললেন মিস্টার ম্যানিং।

ওর সঙ্গে কি পিটার ডেক্সটর বলে কেউ পড়ত?

ডেক্সটার... ডেক্সটর... নো, নো ডেক্সটার ইন দ্য সেমি ক্লাস।

আইসি। ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, যদি অনুগ্রহ করে ফর্টি নাইনটাও একটু দেখে দাও। হয়তো পিটার ডেক্সটর পরের বছর এসেছে।

দুঃখের বিষয় ফর্টি নাইনের খাতাতেও পিটার ডেক্সটরের নাম পাওয়া গেল না। অর্থাৎ এখানে আর আমাদের থাকার কোনও মনে হয় না।

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ভেরি মাচা, বলল ফেলুদা। ইউ হ্যাভ বিন মোস্ট হেলপাফুল!

ট্রেনে আসতে আসতে ফেলুদা বলল, কেমব্রিজে গিয়ে খোঁজ করলেই ডেক্সটরের নাম পাওয়া যাবে। কিন্তু তাও আমার মনে হচ্ছিল যে এখানেও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে মন্দ হত না।

কী বিজ্ঞাপন? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

টাইমসের পার্সোনাল কলামে দেব। নরফোকের পিটার ডেক্সটর সম্বন্ধে কারও কোনও ইনফরমেশন থাকলে সে যেন অমুক হোটেলের অমুক ঘরের অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে।

এতে কী ফল হতে পারে বলে আপনি আশা করছেন?

কীসে ফল হয়। আর কীসে না হয় সেটা তো সব সময় আগে থেকে বলা যায় না। কেমব্রিজের তালিকায় নাম পেলে তো শুধু নামটাই পাওয়া যাবে; লোকটা সম্বন্ধে তো কিছু জানা যাবে না। দিয়েই দেখি না একটা বিজ্ঞাপন।

কিন্তু সে তো বেরোতে বেরোতে তিন-চার দিন লেগে যাবে।

দুদিনের বেশি সময় লাগার কথা না। একটা দিন যদি ফাঁক পাই তা হলে সেদিন আমরা লন্ডন দেখব। এখানে দেখার জিনিসের কি অভাব আছে? মাদাম ত্যুসোর নাম শুনেছেন?

ম্যাডাম টুসড?

আপনার উচ্চারণে তাই।

যেখানে বিখ্যাত লোকেদের মোমের প্রতিকৃতি আছে তো? ইয়েস স্যার। অবশ্য দ্রষ্টব্য। তারপর আর্ট গ্যালারিগুলো আছে, পালামেন্ট হাউসে বিগ বেন। আছে, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল আছে—কত চাই? হেঁটে হেঁটে আপনার পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে যাবে। অথচ এগুলো না দেখলে লন্ডন দেখা হল বলা চলে না।

আপনার বিজ্ঞাপনটা করে দিচ্ছেন?

আজই এক ঘণ্টার মধ্যেই। পরশু বেরিয়ে যাবে।

তা হলে কালকের দিনটা আমরা শহর দেখছি?

হ্যাঁ।

মাদাম তুসো (ফেলুদার উচ্চারণে) দেখে তাক লেগে গেল ঠিকই। প্রত্যেকটা ঘরের দরজার সামনে পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে এমনভাবে যে সেগুলোকেও দেখলে মনে হয় মোমের তৈরি। তারপর চেম্বার অফ হররস–সত্যিই গায়ে কাঁটা দেয়।

মিউজিয়ম দেখার পর বাইরে বেরিয়ে আমরা ফেলুদাকে অনুসরণ করে চললাম। এবারে কোথায় যাচ্ছে সেটা আগে থেকে কিছুই বলল না।

এখানকার অনেক রাস্তার নাম বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে। একটুক্ষণ চলার পর সেইরকম একটা ফলক চোখে পড়ায় ব্যাপারটা এক ঝলকে বুঝে নিলাম। রাস্তার নাম বেকার স্ট্রিট। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে যে শার্লক হোমসের বাড়ি সে কে না জানে? ওই নম্বরে যদিও সত্যি করে কোনও বাড়ি নেই। কিন্তু কাছাকাছি নম্বর তো আছে। ফেলুদা সেইরকম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গভীর গলায় বলল, গুরু, তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি। আজ আমার লন্ডন আসা সার্থক হল।

বিশ্বের গল্প সাহিত্যে যত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে খ্যাতিতে যে শার্লক হোমস নাম্বার ওয়ান সেটা ফেলুদা অনেকবার বলেছে। কন্যান ডয়েল একটা গল্পে তিনি হোমসকে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাবলিক অ্যায়সা হল্লা করে যে ডয়েল বাধ্য হয়ে হোম্‌সকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

বেকার স্ট্রিটে না এলে লন্ডন দেখা সম্পূর্ণ হত না এটা বুঝতে পারলাম।

৮. টাইমসে ফেলুদার বিজ্ঞাপন

দুদিন পরে অর্থাৎ রবিবার, টাইমসে ফেলুদার বিজ্ঞাপন বেরোল। আর আশ্চর্য ব্যাপার–তার পরদিনই বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া গেল। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ফেলুদার ফোন বেজে উঠল। মিনিটখানেক কথা বলে ফেলুদা ফোনটা রেখে বলল, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক। নাম আর্চিবল্ড ক্রিপস। বলল ওর কাছে পিটার ডেক্সটরের খবর আছে। আধা ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাচ্ছে লোকটা। রগড় হতে পারে। তুই লালমোহনবাবুকে খবর দে।

লালমোহনবাবু তৈরি ছিলেন, এসে বললেন এত তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটা উনি ভাবতেই পারেননি।

সোয়া নটার সময় দরজায় টাকা পড়ল। মৃদু নয়, বেশ জোরে। আমি দরজা খুললাম। রুক্ষ গলার সঙ্গে মানানসই রুক্ষ চেহারাওয়ালা একজন ভদ্রলোক ঢুকে এলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রথমে গেল জটায়ুর দিকে।

আর ইউ মিস্টার মিটার?

নো নো। হি, হি।

লালমোহনবাবু ফেলুদার দিকে দেখিয়ে দিলেন। ক্রিপস সাহেব একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে বসে ফেলুদার দিকে কঠোর দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট পিটার ডেক্সটর।

প্রথমত, সে এখন কোথায়?

হি ইজ ইন হেভন।

তার মৃত্যু হয়েছে শুনে আমি দুঃখিত। কবে হল?

আজ নয়। অনেক কাল আগে। হায়েন হি ওয়জ ইন কেমব্রিজ।

উনি কেমব্রিজে পড়তেন?

হ্যাঁ, আর মূর্খের মতো ক্যাম নদীতে নৌকো চালাতে গিয়েছিল।

মূর্খের মতো কেন?

কারণ ও সাঁতার জানত না। নৌকো উলটে গিয়ে জলে পড়ে তার মৃত্যু হয়।

ওঁরা তো শুনেছি অনেক ভাইবোন ছিলেন।

ফাইভ ব্রাদার্স অ্যান্ড টু সিসটারস। তার মধ্যে শুধু দুজনের খবর জানি-বড় ছেলে জর্জ আর ছোট ছেলে রেজি:ন্যান্ড। জর্জ আর্মিতে ছিল, ইণ্ডিপেন্ডেন্সের পর এখানে চলে আসে। বলত শিখ আর গুর্খ ছাড়া ও দেশের সবাই হয় বদমাইস না হয়। অকর্মণ্য। ডেক্সটারদের কেউই ইণ্ডিয়ান নিগারদের পছন্দ করে না।

নিগার? নিগার তো ভারতবর্ষে নেই। ইন ফ্যাক্ট, আমেরিকাতেও আজকাল নিগ্রোদের আর কেউ নিগার বলে না।

ফেলুদার মুখ গম্ভীর। বলল, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে আপনার ধারণাও ডেক্সটরদের মতোই।

তা তো বটেই। একশোবার।

তা হলে আপনার কাছ থেকে আর কোনও ইনফরমেশন আমি চাই না। যেটুকু দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

এই গরম কথাগুলো শুনে ক্রিপস সাহেব যেন একটু নরম হলেন। বললেন, আই অ্যাম সরি ইফ আই হ্যাভ আফেন্ডেড ইউ। রেজিন্যাল্ডের কথাটা বলেই আমি উঠছি। রেজি ন্যাল্ড ওদের ছোট ভাই। সে ইন্ডিয়াতে একটা চা বাগানে আছে, কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।

ফেলুদা চেয়েই রয়েছে ভদ্রলোকের দিকে, মুখে কিছু বলছে না।

বিকজ হি হ্যাঁজ ক্যানসার, বলে চললেন ক্রিপস। ও গিয়েছিল শুধু পয়সা রোজগারের জন্য। ভারতবর্ষের ওপর ওর কোনও মমতা নেই।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার ক্রিপস। আমার আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই।

ক্রিপসও কেমন যেন বাকা-বোকা ভাব করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎগুড ডে বলে সটান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কী জঘন্য লোক মশাই, দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন লালমোহনবাবু। তবে আপনি লন্ডনে বসে একজন সাহেবকে যে ভাবে দাবড়ানি দিলেন, তার কোনও জবাব নেই।

যাই হোক, বলল ফেলুদা, এর কাছ থেকে অন্তত একটা জরুরি তথ্য পাওয়া গেল। পিটার ডেক্সটর কেমব্রিজে ছিলেন এবং নৌকোডুবি হয়ে মারা যান।

এখন কী করা?

সময় হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে, বলল ফেলুদা। পরশু আমাদের ফেরার দিন, ভুলবেন না। আজই দুপুরে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে কেমব্রিজ যাত্রা।

আমরা দেড়টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

পিকাডিলি সার্কাস থেকে প্রথমে লিভারপুল স্ট্রিটে গিয়ে সেখানকার রেল স্টেশন থেকে সাধারণ ট্রেন ধরে যেতে হয় কেমব্রিজে। পৌঁছতে লাগে এক ঘণ্টা। এখানে ট্রেন খুব দ্রুত চলে, আর চড়েও আরাম কারণ কামরাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

সুন্দর শহর কেমব্রিজ, তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে। পাশাপাশি অনেকগুলো কলেজ আছে–ফেলুদা বলল আটশোটা–তবে নিশানাথবাবু বলে দিয়েছিলেন রঞ্জন মজুমদার ট্রিনিটি কলেজে পড়তেন, তাই আমরা সেখানেই খোঁজ করলাম। জানা গেল যে ১৯৫১-তে রঞ্জন মজুমদার ইতিহাস পড়তে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন, এবং তার সঙ্গে একই ক্লাসে ছিল পিটার ডেক্সটার।

এই পিটার ডেক্সটর তো নৌকাডুবি হয়ে মারা যান? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা। যে ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করছিলেন–নাম মিস্টার টেলর–তিনি বললেন যে তিনি মাত্র সাত বছর হল জয়েন করেছেন, কাজেই পুরনো ঘটনা কিছুই জানেন না।

তবে এখানে একজন খুব পুরনো গার্ডনার আছে, চল্লিশ বছর হল এখানে কাজ করছে, নাম হুকিনস। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

ফেলুদা বাগানেই হুকিনসকে পাকড়াও করল। গায়ের চামড়া এখনও বেশ টান-টান, তবে চুল সাদা। তাও দিব্যি কাজ করে চলেছে।

তুমি এখানে অনেকদিন আছ, তাই না? ফেলুদা মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করল।

ইয়েস, বলল হুকিনস। তবে আর বেশিদিন নয়, কারণ আমার রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে। আমার বয়স তেষট্টি হল, কিন্তু এখনও পরিশ্রম করতে পারি। আমার বাড়ি চ্যাটাওয়ার্থ স্ট্রিটে–এখান থেকে দু মাইল। রোজ হেঁটে আসি, হেঁটে ফিরি।

ছাত্রদের সঙ্গে তোমার কীরকম সম্পর্ক?

খুব ভাল। দে অল লাভ মি। আমার সঙ্গে এসে গল্প করে, ঠাট্টা তামাসা করে, আমাকে সিগারেট দেয়, বিয়ার দেয়। আই গেট অ্যালং ভেরি ওয়েল উইথ দেম।

পুরনো ঘটনা মনে থাকে তোমার? স্মরণশক্তি কেমন?

হালের ঘটনা ভুলে যাই, কিন্তু পুরনা কিছু কিছু মনে আছে। অবিশ্যি কত পুরনা তার ওপর নির্ভর করে।

মনটাকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

হোয়াই?

তোমাদের এখানে ক্যাম নদীতে নৌকো চালায় না ছেলেরা?

শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও চালায়।

কোনও নৌকোডুবির ঘটনা মনে পড়ছে?

হুকিনস মাথা নেড়ে-গলাটাকে ভারী করে বলল, ইটস এ স্যাড স্টেরি, স্যাড স্টোরি। একটি ইংরেজ ছেলে, নাম মনে নেই। নৌকো উলটিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। সাঁতার জানত না।

সে কি একাই ছিল?

একা? না বোধহয়। সঙ্গে বোধহয় আরেকজন ছিল।

ঠিক করে ভেবে বলে তো।

অত দিন আগের কথা তো– তাই ভাল মনে পড়ছে না।

ওই ইংরেজ ছেলেটির একজন ভারতীয় বন্ধু ছিল না?

আই থিঙ্ক হি হ্যাড।

একটু চেষ্টা করে মনে করে দেখো তো-সেই ভারতীয় ছেলেটিও নৌকোয় ছিল কি না।

মে বি হি ওয়াজ-মে বি হি ওয়াজ...

ওই ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে?

আমি একটা ঝোপের ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। হয়তো সিগারেট খাচ্ছিলাম।

ঘটনাটা তুমি দেখেছিলে?

হেলপ-হেলপ চিৎকার শুনে আমি নদীর ধারে যাই। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড!

তা হলে তো তোমার মনে থাকা উচিত নৌকোতে আর কেউ ছিল কি না।

হুকিনস মাথা হেঁট করে যেন ভাববার চেষ্টা করল। তারপর বলল, নাঃ—এর বেশি আর মনে করতে পারছি না! আই অ্যাম সরি। এইটুকু যে মনে আছে তার একটা কারণ ওই একই দিনে আমি বিয়ে করি। ম্যাগি। দ্য বেস্ট ওয়াইফ ওয়ান কুড হ্যাভ।

৯. হোটেলে আত্মহত্যা

টাইমসের বিজ্ঞাপনের ফল যে মিস্টার ক্রিপস-এর আসাতেই শেষ হয়ে গেল তা নয়। কেমব্রিজ যাবার পরদিনই ফেলুদা টেলিফোন পেল এক ভারতীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে-নাম সত্যনাথন। মাদ্রাজি, তাতে সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন পিটার ডেক্সটর সম্বন্ধে কিছু তথ্য তিনি দিতে পারেন। আমি এগারোটা নাগাদ তোমাদের হোটেলে পৌঁছতে পারি।

খুব ভাল কথা, বলল ফেলুদা, চলে আসুন।

সত্যনাথন কথা মতো এলেন। বেশ গাঢ় কালো রং, মাথার চুল একেবারে সাদা। একটা চেয়ারে বসে বললেন, বিজ্ঞাপনটা পড়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু কয়েকটা কাজে একটু আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

আপনি লন্ডনেই থাকেন?

না। কিলবার্নে। এখান থেকে বেশি দূর নয়! ওখানে একটা ইস্কুলে মাস্টারি করি। পিটার ডেক্সটরের সঙ্গে একসঙ্গে আমি কেমব্রিজে ছিলাম।

তার মানে রঞ্জন মজুমদারও আপনার সহপাঠী ছিল?

তা তো বটেই।

তাকে মনে আছে?

স্পষ্ট। পিটারের খুব বন্ধু ছিল। অবিশ্যি দুজনের মধ্যে ঝগড়াও হত প্রায়ই।

কী নিয়ে?

পিটার ভারতীয়দের একেবারে পছন্দ করত না। রঞ্জনকে দেখে একেবারে সাহেব বলে মনে হত, তাই পিটার তাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়। বলত—ইউ আর নট ইন্ডিয়ান, ইউ আর হাফ ইংলিশ।

আপনার সঙ্গে পিটারের কীরকম সম্পর্ক ছিল?

আমার গায়ের রং তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমাকে সে বহুবার ডার্টি নিগার বলে সম্বোধন করেছে। আমি ব্যাপারটা হজম করে নিতাম।

পিটারের মৃত্যুর কথা মনে আছে?

তা থাকবে না? এমন কী দিনটাও মনে আছে-হুইট-সানডের আগের দিন। পিটার, যখন সাঁতার জানত না তখন ওর নৌকোয় চড়া অত্যন্ত ভুল হয়েছিল।

ওর সঙ্গে আর কে ছিল?

রঞ্জন।

সে বিষয় আপনি নিশ্চিত?

অ্যাবসোলিউটলি। রঞ্জনের সর্বাঙ্গ জলে ভেজা চেহারাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। আমি তখন আমার ঘরে ছিলাম। আমাদের মালী হুকিনসের চেচামেচিতে বাইরে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপারটা জানতে পারি। রঞ্জন তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাই ইট ওয়জ টুঁ লেট। রেজিনাল্ডও চেষ্টা করেছিল দাদাকে বাঁচাতে, কিন্তু পারেনি।

পিটারের পরের ভাই?

হ্যাঁ। সে আমাদের পরের বছরই কেমব্রিজে ভর্তি হয়। সেই একই ছাঁচে ঢালা। ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি লেগে যেত। অনেকবার ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

কোনও ফল হয়নি। রেজি:ন্যান্ডের ধারণা ছিল রঞ্জন ইচ্ছা করলে পিটারকে বাঁচাতে পারত। এই কথা সে সারা কলেজে বলে বেড়াত-হি ডেলিবারেটলি লেট হিম ড্রাউন।

রঞ্জন মজুমদার তো এক বছরের বেশি কেমব্রিজে পড়েনি?

না। একটা বাইসিক্ল অ্যাক্সিডেন্টের পর সে দেশে ফিরে যায়।

কথা শেষ, তাই সত্যনাথন উঠে পড়লেন। ওঁর কাছ থেকে একটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল—নীকোঁতে পিটারের সঙ্গে রঞ্জন ছিলেন, আর তিনি বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা করে পারেননি। সত্যনাথন চলে যাবার পর থেকেই লক্ষ করলাম ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল। লাঞ্চ খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন, আপনাকে যেন ডিসস্যাটিসফায়েড বলে মনে হচ্ছে। কারণটা জানতে পারি কি?

একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।

কী?

মনে হচ্ছে হুকিনস যা বলেছে তার চেয়ে বেশি ও জানে এবং ওর মনে আছে। কোনও একটা কারণে তথ্য লুকিয়ে যাচ্ছে।

তা হলে কী করবেন?

আরেকবার কেমব্রিজ যাওয়া দরকার। এবারে হুকিনসের বাড়ি। রাস্তার নামটা ও বলেছিল। মনে আছে, তোপ্‌সে?

মনে ছিল। বললাম, চ্যাটওয়ার্থ স্ট্রিট।

ভেরি গুড। কেমব্রিজ গিয়ে রাস্তার একটা পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেই বাতলিয়ে দেবে। এটাও জেনে রাখুন, লালমোহনবাবু-এখানকার পুলিশ, যাকে এরা বলে ববি-এদের মতো হেলপাফুল পুলিশ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল ওর একটা কাজ আছে, ও একটু বেরোবে। ও ফিরলে তারপর আমরা কেমব্রিজ যাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেমব্রিজের ট্রেন ছাড়ে-কোনও অসুবিধা নেই।

সাড়ে চারটায় রওনা হয়ে আমরা যখন কেমব্রিজে পৌঁছলাম, তখন রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। আমরা একটা বড় রাস্ত ধরে এগিয়ে একটা পুলিশের কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

চ্যাটওয়র্থ স্ট্রিট কোথায় বলতে পার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। পুলিশ প্রায় কাগজে নকশা আঁকার মতো করে বুঝিয়ে দিল।

আধঘণ্টা লাগল চ্যাটওয়্যর্থ স্ট্রিট পৌঁছতে। এটাকে গলি বললেই চলে, দেখে বোঝা যায় যে খুব অবস্থাসম্পন্ন লোকেদের পাড়া নয়। একটা বাড়ির সামনে একজন লোক রাস্তা থেকে একটা বেড়ালকে তুলে কোলে নিল। তাকেই ফেলুদা জিজ্ঞেস করল হুকিনস কোন বাড়িতে থাকে।

ফ্রেড হুকিনস? ভদ্রলোক বললেন। নাম্বার সিক্সটন।

এখানে সব বাড়ির বাইরেই নম্বর লেখা থাকে, তাই ষোলো খুঁজে পেতে সময় লাগল না।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতে হুকিনস নিজেই দরজা খুলল।

গুড ইভনিং, বলল ফেলুদা।

আমাদের দেখে হুকিনসের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সে কী-তোমরা আবার...?

একটু ভিতরে আসতে পারি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

হুকিনস এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের ঢোকবার জায়গা করে দিল। আমরা তিনজনে ঢুকলাম। এটাই বসবার ঘর, যদিও আয়তনে খুবই ছোট। আমরা দুটো চেয়ারে আর একটা সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম।

ওয়েল?

ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি দিলে হুকিন্‌স।

তোমাকে দু একটা প্রশ্ন করার ছিল।

অ্যাবাউট দ্য ড্রাউনিং?

হ্যাঁ।

আমি যা বলেছি তার বেশি তো আর কিছু জানি না।

আমি নতুন প্রশ্ন করব।

কী?

মিস্টার হুকিনস, যে নৌকো ধীরে চলছে, তাতে কেউ বসা অবস্থায় জলে পড়ে যেতে পারে এটা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?

যদি ঝড় থাকে তা হলে নৌকে নিশ্চয়ই উলটে যেতে পারে। দেয়ার ওয়জ এ হাই উইন্ড দ্যাট ডে।

আমি আজই দুর্ঘটনার পরের দিনের খবরের কাগজ দেখেছি। তাতে পিটার ডেক্সটরের মৃত্যু সংবাদ আছে, কিন্তু ঝড়ের কোনও খবর নেই। ওয়েদার রিপোর্টে বলছে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। সেটাকে কি তুমি হাই উইন্ড বলবে?

হুকিনস চুপ। আর একটা টেবিল ক্লকের টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ফেলুদা বলল, আমার ধারণা তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছ। সেটা কী দয়া করে বলবো?

এতদিন আগের ঘটনা...

কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে দুজনকে নিয়ে ঘটনা, তার মধ্যে একজন তো তোমার বেশ কাছের লোক ছিল বলে মনে হচ্ছে।

হুকিনস ফেলুদার দিকে চাইল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তার দৃষ্টিতে সংশয় ঘনিয়ে আসছে।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

তোমার শেলফে আমি অনেকরকম জিনিসের মধ্যে একটা পিতলের গণেশ আর একটা আইভরির বুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো কী করে পেলে জানতে পারি কি?

রন দিয়েছিল আমাকে।

রন মানে বোধ করি রঞ্জন।

ইয়েস। ওকে আমি রনও বলতাম, রনও বলতাম।

আই সি। এবার একটা কথা বলো—পিটারের হেলপ হেলপ চিৎকারের আগে তুমি ওদের কোনও কথা শোনোনি? ইন্ডিয়ান গডদের সামনে মিথ্যা কথা বলা কিন্তু মহাপাপ।

কী কথা বলছিল বুঝিনি—আই ওনলি হার্ড দেয়ার ভয়েসেস।

তার মানে ওরা বেশ জোরে কথা বলছিল?

পারহ্যাপস...পারহ্যাপস...

আমার কী বিশ্বাস জান?

হুকিনস আবার ফেলুদার দিকে দেখল।

হোয়াট?

আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। পিটার দাঁড়িয়ে উঠেছিল, আর--

ইয়েস, ইয়েস। হুকিনস হঠাৎ বলে উঠল। আর ও রনকে আক্রমণ করতে যায়, আর টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়।

তার মানে পিটার তার মৃত্যুর জন্য নিজেই দায়ী?

অফ কোর্স!

তোমাদের এই যে ক্যাম নদী, আমাদের দেশে এটাকে বলে কেন্যাল। এতে একটা লোক সাঁতার না জানলেও এত সহজে ডুবে যেতে পারে। -বিশেষ করে যখন তাকে একজন বাঁচাবার চেষ্টা করছে?

ডুবল যে সে তো চোখের সামনে দেখলাম।

তুমি এখনও সত্যি কথা বলছি না, মিস্টার হুকিনস। আই ওয়ান্ট দ্য ট্রুথ। আমি এত দূর থেকে এসেছি শুধু এই ট্রুথের সন্ধানে; পিটার কেন এত সহজে ডুবে গেল?

হুকিনসকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে সে ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছে! এবার সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল, ঠিক আছে, আমি বলছি কেন পিটার ডুবে যায়। তার কারণ ও যখন জলে পড়ে তখন ওর জ্ঞান ছিল না।

জ্ঞান ছিল না?

ফেলুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে হুকিনসের দিকে। তারপর চাপ স্বরে বলল, বুঝেছি। নৌকো বাইছিল রঞ্জন, তাই না?

ইয়েস।

তার মানে তার হাতে দাঁড় ছিল।

ইয়েস।

অর্থাৎ একটা অস্ত্র ছিল, যেটা দিয়ে সে পিটারকে আঘাত করে। তার ফলে পিটার সংজ্ঞা হারিয়ে জলে পড়ে যায়। অর্থাৎ সে কোনও স্ট্রাগলই করেনি। আর রঞ্জন যে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল সেটা একটা অভিনয়। অর্থাৎ রঞ্জনই পিটারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

হুকিনস মাথা চাপড়ে বলল, আমি তোমাদের আঘাত দিতে চাইনি। তাই সত্য গোপন করছিলাম। রঞ্জনের জায়গায় আমি থাকলে আমিও ওরই মতো করতাম। পিটার ওকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছিল। বলছিল তোমার চামড়া সাদা হলে কী হবে, আঁচড় কাটলেই দেখা যাবে। নীচে কালো। ইউ আর নাথিং বাট এ ডার্টি ব্ল্যাক নেটিভ। এতে কার মাথা ঠিক থাকে বলো!

তুমি ছাড়া এই ঘটনার সাক্ষী আর কেউ ছিল?

ইয়েস। ওনলি ওয়ান।

কে?

রেজিন্যাল্ড ।

রেজিন্যাল্ড ডেক্সটর?

আমরা দুজন একসঙ্গেই বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। সমস্ত ঘটনাই আমরা দুজন একসঙ্গে দেখি। পরে আমি রনকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম পিটার রনকে আক্রমণ করতে গিয়ে জলে পড়ে যায়। এদিকে রেজিন্যাল্ড অনবরত সত্যি ঘটনাটা বলে বেড়াচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সকলেই জানত যে রেজিন্যাল্ড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে, তাই তার কথা

কেউ বিশ্বাস করেনি। থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট–রন ওয়জ সাচ এ নাইস বয়, সে জেনা্রাস, সে কাইন্ড।

এ ব্যাপারে তদন্ত হয়নি? ইনকুয়েস্ট হয়নি?’

হয়েছিল বইকী।

তুমি সাখকী দিয়েছিলে?

ইয়েস।

মিথ্যে সাক্ষী তো?

তা বটে। আই ওয়জ ডিটারমিনড টু সেভ রঞ্জন। সেও অবশ্য সাক্ষী দিয়েছিল। আমি যা বলেছিলাম, সেও তাই বলেছিল।

আর রেজিন্যাল্ড ? সে সাক্ষী দেয়নি?’

হ্যাঁ-এবং সে সত্যি ঘটনাই বলেছিল। তবে তার কথায় ভারতীয় বিদ্বেষ এত প্রকাশ পাচ্ছিল যে জুরি তার কথা বিশ্বাস করেনি। তারা রায় দিয়েছিল ডেথ বাই অ্যাক্সিডেন্ট।

ফেলুদা উঠে পড়ল।

থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার হুকিনস। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।

হোটেলে ফিরলাম ডিনারের ঠিক আগে। রিসেপশন থেকে ঘরের চাবি নিচ্ছি, এমন সময় একজন কর্মচাবী ফেলুদার দিকে চেয়ে বলল, মিস্টার মিটার ?

ইয়েস।

তোমার একটি টেলিগ্রাম আছে।

ফেলুদা টেলিগ্রামটা নিয়ে খুলে পড়ল। পাঠিয়েছেন রঞ্জন মজুমদার। তিনি বলছেন- ক্যান রিকল এভরিথিং। রিটার্ন ইমিডিয়েটলি।

পারফেক্ট টাইমিং, বলল ফেলুদা। এখানের মামলা শেষ, কাল আমাদের রিটার্ন বুকিং, আর মিস্টার মজুমদারের স্মৃতি ফিরে এসেছে।

প্লেনেই ফেলুদা বলেছিল যে দমদম থেকে সোজা মিস্টার মজুমদারের বাড়ি যাব। আমরা কলকাতায় পৌঁছাচ্ছি। দুপুর একটা পাঁচে।

মনে গভীর উৎকণ্ঠা। রঞ্জনবাবু জানেন তিনি খুন করেছিলেন; এখন তিনি কী করবেন ?

আমাদের ফেরার তারিখ আর সময় আগে থেকেই জানা ছিল, তাই লালমোহনবাবুর গাড়ি এয়ারপোর্টে হাজির ছিল।

রোল্যান্ড রোডে পৌঁছে বুকটা ধক করে উঠল। রঞ্জনবাবুর বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি কেন?

গাড়ি থেকে নেমে গেটের ভিতর ঢুকতেই আমাদের চেনা ইনস্পেকটর মণ্ডল গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন।

আজ সকাল আটটায় ব্যাপারটা ঘটেছে।

কী ব্যাপার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

মিস্টার মজুমদার খুন হয়েছেন। সকালে নাকি একজন সাহেব এসেছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সে কে তা জানা যায়নি। আপনি কোনও এনকোয়ারি করবেন?

না।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় লালমোহনবাবু এসে হাজির। ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত। পাঁচ নম্বরের পাতার খবরটা দেখেছেন?

কোন কাগজ? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

স্টেটসম্যান–আবার কোন কাগজ।

না, এখনও দেখিনি।

প্রথম পাতায় তো মজুমদারের খবরটা রয়েছে-এবার পাঁচের পাতা দেখুন।

ফেলুদা কাগজটা নিয়ে পাঁচের পাতা খুলল। 'নীচে বা দিকে', বললেন জটায়ু। খবরটা বার করে ফেলুদা পড়ে শোনাল। তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়–

হোটেলে আত্মহত্যা

সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে গতকাল রাত্রে গুলির আওয়াজ পেয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায় সাত নম্বর ঘরে একটি সাহেব মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর হাতে রিভলভার। হোটেলের খাতা থেকে জানা যায় সাহেবের নাম রেজিনাল্ড ডেক্সটার। ইনি এসেছিলেন দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী খয়রাবাড়ি চা বাগান থেকে।